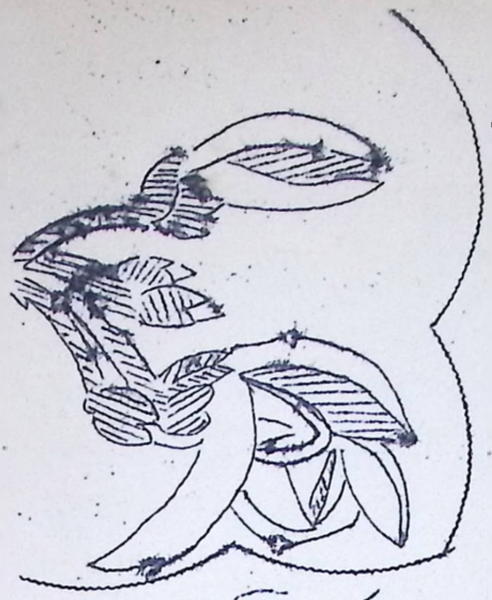

আমাদের মৌন প্রতিবেশী

০ পলাশ

—এম,এ, মুহীদ ॥ অধ্যাপক ॥
বন-মহাবিদ্যালয় ॥ চট্টগ্রাম ॥

আদি পর্যায়ে পৃথিবীটা ছিল বিষাক্ত বাষ্পে আবৃত। এর মধ্যে ধীরে ধীরে জন্ম নিল গাছপালা। গাছপালার শ্বাস প্রশ্বাসে পৃথিবীর সে বিষাক্ত পরিবেশটা ক্রমে পরিশোধিত হয়ে হলো প্রানীকুলের বাসোপযোগী। আর সেই জন্যেই কালে পৃথিবীর বুকে মানুষের উদ্ভব সম্ভব হলো। অচিরে মানুষ এটাও টের পেল যে গাছপালা ব্যতীত তার বেঁচে থাকা সম্ভবপর নয়। তার আহার্য, বস্ত্র, বাসস্থান —— নিত্য প্রয়োজনীয় সব কিছুর জন্যই বৃক্ষ এবং বৃক্ষজাত দ্রব্য অপরিহার্য। তার মনে হলো সে যে বেঁচে আছে তা শুধু গাছপালারই কৃপায়। মানুষ তাই আরম্ভ করল বৃক্ষ-পূজা। ইউরোপের মত সুসভ্য দেশেও Maypole, Maygreen, Mayday ইত্যাদিতে আদিম যুগের সেই বৃক্ষ-পূজার স্বাক্ষর আজও বহন করে আসছে।

সভ্য মানুষ আজ গাছের পূজা করে না। ইউরোপ হোক আর আমাদের দেশই হোক — সাধারণ লোকের কাছে গাছপালার মর্যাদা কম। গাছ কাটতে গিয়ে মানুষ আজ আর গাছের অধিষ্ঠাতা উপদেবতাকে সন্তুষ্ট করার প্রয়োজন বোধ করে না। বিধাতার অপূর্ব সৃষ্টি এই গাছপালার সঙ্গে আমাদের জীবন এত ওতপ্রোত ভাবে জড়িত যে শুধুমাত্র জ্ঞান চর্চার আনন্দের জন্যই আমাদের এই ভাষাহীন প্রতিবেশীদের প্রতি আমাদের কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। গাছপালা

তো সর্বত্রই রয়েছে। বাসস্থানের আশে পাশে, সমুদ্রের গভীরে, খনির অন্ধকার গহ্বরে, পর্বতের তুষার-ময় শিখরে সব জায়গায়—রয়েছে এই গাছপালা। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এদের সম্পর্কে আমরা কতটুকুই বা কৌতূহলী। বর্ষা কালে আমাদের এতদ--ঞ্চলে চলতে বুনো ঝুমকোলতা প্রায়ই চোখে পড়ে। এই ঝুমকো ফুল দেখে কি আমরা ভাবি যে একদা স্পেন দেশীয় পাদ্রীরা এই ঝুমকো ফুলের মাঝে যীশুখৃষ্টের ক্রুশবিদ্ধ হবার ঘটনা উৎকীর্ন দেখতে পেয়েছিল। আর মেক্সিকো দেশে এই ফুল পাওয়াটাকে তারা সেদেশে খৃষ্টধর্ম-প্রচারের দৈবাদেশ বলে গ্রহন করেছিল। পৃথিবী ব্যাপী খৃষ্ট ধর্ম বিস্তার লাভ করার পেছনে ঝুমকো ফুলের দান অপরিসীম। শীতের দিনে অরন্যের উপকন্ঠে চলতে গিয়ে আমরা কত ড্রসেরা (কন্যা যাত্রা, মুখ জ্বালি) পায়ে দলে যাই। তখন কি আমরা ভাবতে পারি যে আসলে এই ড্রসেরা একটা ভয়ংকর মাংসাশী উদ্ভিদ। সব সময় সামনে আছে বলেই এই সাধারন গাছগুলো আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় তাই এদের মাঝে সৃষ্টির বিচিত্রতা অবলোকন করতে আমরা হই অসমর্থ।

চট্টগ্রামে বসে আমাদের মৌন প্রতিবেশী এই গাছ--পালা সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই আসে পলাশের কথা। পাকিস্তান, ভারত ও ব্রহ্মদেশের প্রায় সর্বত্র এবং বিশেষ করে অপেক্ষাকৃত শুষ্ক-অঞ্চলে পলাশ দেখতে পাওয়া যায়। বাংলাদেশ যে অনেকদিন আগ থেকেই পলাশের বাসভূমি — তা বাংলা তথা পাক-ভারতের ভাগ্য বিপর্যয়ের স্মৃতি বিজড়িত পলাশীর ঐতিহাসিক প্রান্তরের নাম থেকেই প্রমানিত হয়। আমাদের এই চট্টগ্রাম শহরে কিন্তু পলাশের এই অবস্থিতির কারন মনে হয় অনেক-

সর্গিক। চট্টগ্রামের বনাঞ্চলে পলাশ কদাচিৎ দেখা যায়, গ্রামাঞ্চলেও তার তেমন আধিক্য নেই। কিন্তু চট্টগ্রাম শহরে পলাশের ছড়াছড়ি।

ছোট গলির নগণ্য ছোট মেয়েটি একদিন যেমন হঠাৎ যৌবনের মাধুর্যে মণ্ডিত হয়ে তার অবস্থিতি সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করে তোলে পলাশও তেমনি করে। অষ্টাবক্র পত্রহীন, পলাশ গাছ সারা শীতকালটা কারও বড় একটা দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। হতশ্রী, ছাই রং পলাশ গাছ যেন তখন ভস্ম মেখে উদাসিনী হয়ে কার প্রতীক্ষায় থাকে। কিন্তু শীতের শেষে হঠাৎ একদিন সে অগ্নিবর্ণ পুষ্পে আপাদ মস্তক সজ্জিত হয়ে ঝলমল করতে থাকে। আর সেই অগ্নিকন্যার আবাহনে যেন গ্রীষ্মের খরতাপ আসে নেমে। ইংরেজীতে তাই পলাশের "FLAME OF THE FOREST" নাম করণ সার্থক। ইংরেজীতে পলাশকে PARR-OT TREE এবং BASTARD TEAKও বলা হয়। হিন্দী ও উর্দুতে বলা হয় ঢাক আর সংস্কৃতে কিংশুক। পলাশ ও কিংশুক নামে এই গাছ বাঙালী কবিদের বড় প্রিয়। উদ্ভিদ বিজ্ঞানের ভাষায় পলাশের নাম 'বুটিয়া মনোস্পারমা'। উদ্ভিদ-রসিক আর্ল-অব বুটি এর নামানুসারে এই নাম। মনোস্পারমা অর্থ একবীজ বিশিষ্ট। পলাশ লেগুমিনোসি গোত্রভুক্ত পেপিলিওনেসি সহ গোত্রের অন্তর্গত। তিন ফলক বিশিষ্ট পাতা, প্রজাপতির মতো ফুল আর সীমের মত ফল পলাশের পারিবারিক বৈশিষ্ট্য।

হিন্দুদের নিকট পলাশের মর্যাদা অনেক। সোমরসে সিক্ত বাজপাখীর পালক থেকে এ গাছ উদ্ভূত বলে পুরাণে উল্লেখ আছে। পলাশ পাতার তিনটি ফলক ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের প্রতিচ্ছবি। যজ্ঞ ও হোমে পলাশ কাঠ এবং উপনয়ন ও দীক্ষায় পলাশ পাতা ব্যবহার হয়। পলাশ ফুল থেকে নিষ্কাশিত বাসন্তী রং এ বসন রঞ্জিত করে পূজারীরা দেবতার কাছে দেবপ্রিয় পলাশ ফুলের অর্ঘ্য নিবেদন করেন।

বৌদ্ধরা পলাশ ফুলকে অনুতপ্ত ভক্তের সঙ্গে তুলনা করেন। কবি আমীর খসরু কিন্তু এ ফুলকে তুলনা করেছেন — সিংহের রক্তাক্ত থাবার সঙ্গে।

পলাশ গাছ বেশ উপকারেও আসে। তৃণাচ্ছাদিত ভূমির উর্বরতা বাড়াতে পলাশ গাছ অদ্বিতীয়। পলাশ গাছে উৎপাদিত লাক্ষা কুসুম গাছের লাক্ষা থেকে কিছুটা নিকৃষ্ট হলেও পরিমাণের দিক থেকে পলাশের লাক্ষাই শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। আদিবাসীরা পলাশের কচি শিকড় ভেজে খায়। পলাশের পাতা ভোজন পাত্রের কাজে লাগে; কাণ্ড থেকে উৎপন্ন কিনো নামে পরিচিত আঠা চামড়া পাকা করার কাজে এবং রোগ চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

পুষ্পিত পলাশ গাছ নিতান্ত বেরসিকেরও মনো-রঞ্জনে সমর্থ।